দরজায় খুট খুট একটা শব্দ হচ্ছে। এই সাত সকালে আবার কে এলো?

আমাদের এই বাড়ীর দরজায় একটা কলিং বেল আছে, অথচ কলিং বেল না টিপে থেকে থেকে, দরজায় খুট খুট শব্দ করছে। কেমন যেনো অনেকটা সন্দেহজনক, ব্যাপারটা।

বাবার ঘুম ভাঙে সাধারণত অনেক দেরীতে। বাবা প্রতি রাতে, তার ঐ ভাঙা চুড়া কারখানাটা থেকে ফিরে এসেও রাত দু টা তিন টা পর্যন্ত কি সব লাভ লোকসানের হিসাব কিতাব শেষ করে ঘুমোতে যায়। এখন এই সকাল সাতটায় বাবার ঘুমটা থাকে সবচেয়ে গভীর। আমার মনে হয়, এই মুহুর্তে বাবার গায়ের উপর এক ঝাঁক মশা উড়ে উড়ে ঘুম ভাঙানির গান গেয়ে গেলে ও টের পাবার কথা না।

আমাদের এই মাতৃহীন পারিবারের আমার একমাত্র ছোট বোন দোলা, এই মুহুর্তে রান্না ঘরে সকালের নাস্তার আয়োজনে ব্যাস্ত। রান্না ঘর থেকে দরজায় ওই খুট খুট শব্দ টা শুনা যাবার কথা না। আমি সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠে, অনেকটা তড়িঘড়ি করে হাত মুখ ধুয়ে, চিটাগং শহর থেকে ইন্যুভার্সিটি যাবার সাতটা চল্লিশের ট্রেনটা ধরার জন্যে, পোষাক পালটানোর উদ্যোগ করছিলাম। আর তেমনি একটা মুহুর্তে দরজায় খুট খুট শব্দে, আমি সাংঘাতিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠেছিলাম।

আমার ঘরের দরজা জানালা সব বন্দ্ধ। তারপরও, দরজায় ওই খুট খুট শব্দে আমি অনেকটা দিশেহারা হয়ে নিজের অজান্তেই বিছানার চাদরটা টেনে প্রথমে আমার নগ্ন বক্ষ ঢাকতে চেষ্টা করলাম। ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওয়ার্ডরবের ড্রয়ারে যে কামিজটা প্রথমেই চোখে পরলো, সেটাই পরে নিলাম। দরজায় খুট খুট শব্দটা আবারও কানে এলো।

ম্যাচ করে পাজামা পরার মতো মুহূর্ত এখন নয়। ভয়ে আমার শরীর রীতিমতো কাঁপছে। আপাততঃ চোখের সামনে যাই পেলাম, তাই দিয়ে নিজের একটা সম্ভ্রম করে নিলাম।

আমি অনেকটা ভয়ে ভয়ে, আর কিছুটা কৌতূহলে, বসার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। বসার ঘরের জানালার পর্দা খানিকটা সরিয়ে চুপি দিলাম বারান্দায়। বারান্দায় চুপি দিয়ে যাকে দেখলাম, তাতে করে সত্যিই আমি বোকা বনে গেলাম।

হেনা!

ইন্যুভার্সিটিতে আমাদের ইয়ার মেইট। বান্ধবী বললাম না ইচ্ছে করেই। কারন, হেনা আমার বান্ধবী পর্যায়ে পরেনা। তবে, হেনা খুব চমৎকার মেয়ে। না, তার চেহারার কথা বলছিনা। অবশ্যই, হেনার চেহারা ভাড়ী মিষ্টি। তার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলতে কোন ধরনের গায়ের রংকে বুঝায়, আমি নিজেও ভালো বুঝিনা। আমি বুঝাতে চাইছি, হেনার গায়ের রং কালো না, আবার ফর্সা ও না। তবে, খানিকটা ফর্সার দিকে। তার গোলাকৃতি মুখমণ্ডলে, ঠোটযুগলের অবস্থান আর আকৃতি সত্যিই নজর কাড়া। এই ধরনের চেহারার মেয়েরা ঠোটে লিপস্টিক মাখলে বিশ্রী লাগে। ব্যাপারটা বোধ হয় হেনা জানে। ইন্যুভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর গত তিন মাসে তাকে কখনো ঠোটে লিপস্টিক দিতে দেখিনি। তেমন সাঁজগোঁজ ও করে না মেয়েটা। মুখমণ্ডলে যে পাউডার মাখে তা স্পষ্ট বুঝা যায়, আর ঠোটে রংহীন লিপসন জাতীয় কিছু। তাতে করে হেনার ঠোটগুলো অত্যাধিক আকর্ষণীয় লাগে। আর হাসলে যখন সেই ঠোটযুগলের ভেতর থেকে উপরের পাটির ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে আসে, তখন সাদা মুক্তোর দানাও তুচ্ছ লাগার কথা।

হেনার সাথে আমার পরিচয় ইন্যুভার্সিটির সাবসিডিয়ারী ক্লাশে। ইন্যুভার্সিটির সাবসিডিয়ারী ক্লাশের ব্যাপারটা বিরক্তিকর। পাশ তো করতেই হবে, তার উপর ক্লাশে উপস্থিতিতির পার্সেন্টেজও থাকতে হবে শতকরা ষাট ভাগের উপর। নিজ নিজ সাবজেকেটর বাইরেও অন্য বিষয়ের উপরও জ্ঞান অর্জন করার জন্যেই বোধ হয় এই ব্যাবস্হাটার উৎপত্তি। আমার মনে হয় না, এই ব্যাবস্হায় ছাত্রছাত্রীদের আদৌ কোন জ্ঞান অর্জন হচ্ছে বলে। আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে অনেক ত্রুটি আছে। এটি তার মধ্যে একটি।

হেনা সমাজ বিদ্যার ছাত্রী, আমি লোক প্রশাসনে। আমাদের দুজনের কমন সাবসিডিয়ারী হলো, রাজনীতী বিজ্ঞান। সমাজ বিদ্যার ছাত্রছাত্রীদের খুব কমই দেখা যায় রাজনীতী বিজ্ঞানের সাবসিডিয়ারীতে। হেনার কথা মতো, সে না বুঝে, ভুল করে সাবসিডিয়ারী হিসেবে, রাজনীতী বিজ্ঞান নিয়েছে।

সাবসিডিয়ারী ক্লাশগুলো হয় সাধারণতঃ বিশাল গ্যালারীতে। সেদিন কলা ভবনের চার নম্বর গ্যালারীতে মাঝামাঝি দিকের সারিতে, লম্বা বেঞ্চির একদম কোনার দিকে বসে, ক্লাশের লেকচার শুনছিলাম আমি। খানিকটা দেরীতে ক্লাশে ঢুকে, যে মেয়েটি আমার পাশে এসে বসেছিলো, সে হলো এই হেনা।

সেদিন একজন অধ্যাপক পর্যায়ের শিক্ষক, একটা সিরীয়াস টপিক নিয়ে লেকচার দিচ্ছিলো। অধ্যাপকেরা সাধারণতঃ সাবসিডিয়ারী ক্লাশ নেন না। ওটা ছিলো একটা বিশেষ ক্লাশ। রাজনীতী বিজ্ঞানের একজন তোখোর লোক, সেই অধ্যাপক। দেশে বিদেশে যার প্রচণ্ড নাম ডাক। সাবসিডিয়ারী ক্লাশের মাধ্যমে অন্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সাথে পরিচিত হওয়াটাই ছিলো ওই অধ্যাপকের বিশেষ ক্লাশের উদ্দেশ্য। আমি যখন অনেকটা মনোযোগ দিয়ে অধ্যাপকের লেকচার শুনছিলাম, আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নোটবুকে টুকে নিচ্ছিলাম, তখন দৈবাৎই চোখে পরলো, আমার পাশে বসা মেয়েটি খাতায় কি সব অদভুৎ কাটাকুটি করছে।

ক্লাশ শেষ হলো যথারীতী। অধ্যাপক সাহেব ক্লাশ থেকে বেড়োনোর সময় একটি ছাত্র দাঁড়িয়ে বললো, স্যার, পার্সেন্টেজ? অধ্যাপক মজা করে হেসে বললো, তুমি বুঝি পার্সেন্টেজের জন্যে ক্লাশ করো! ঠিক আছে আজকে সবাইকেই পার্সেন্টেজ দিয়ে দেব।

অধ্যাপকের কথা শুনে আমার পাশে বসা মেয়েটি তখন বিড় বিড় করে কি যেনো বললো। মনে হয় পার্সেন্টেজ নিয়ে কোন কিছু হবে। স্পষ্ট বুঝা গেলো না। আমি ক্লাশ থেকে বেড়োনোর উদ্যোগ করছিলাম। অথচ, মেয়েটি তখনো ঠাই বসে আছে। গ্যালারী বেঞ্চির এই সারিতে গোটা দশেক ছাত্রছাত্রীর একটা নাতিদীর্ঘ লাইন আমার পেছনে। আমার ঠিক পেছনে যে ছেলেটি, সেতো পারলে আমার গা ঠেলে বেড়োনোর উদ্যোগ করছে।

কিছু কিছু অতি চঞ্চল ছেলে বেঞ্চির উপর উঠে তড় তড় করে ছুটে বেড়িয়ে যাচ্ছে ক্লাশ থেকে। আমি আমার পাশে বসা মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বললাম, দুঃখিত! একটু সরে দাঁড়াতে আপনার কি কোন সমস্যা হবে? সবাই কিন্তু বেড়োতে চাইছে!

মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাঁকালো, তারপর রসিকতার সুরে বললো, নাহ, কোনই সমস্যা হবে না।

সে, হাই বেঞ্চির উপর থেকে তার খোলা খাতাটা, আর পাশ থেকে চটের ব্যাগটা নিয়ে বেঞ্চি থেকে বেড়িয়ে সরে দাঁড়ালো। তারপর আমাদেরকে হাত দিয়ে ইশারা করলো বেড়োতে। মুখে কিছু বললো না। মেয়েটির ভাবসাব দেখে মনে হলো কোন অভিজাত পরিবারের মেয়ে টেয়ে হবে!

সেদিন আমাদের পরবর্তী ক্লাশ এগারটা পনের মিনিটে। তখন সাড়ে দশটা। মাঝে এক পিড়িয়ডের গ্যাপ। এই গ্যাপের সময়টাতে কি করবো ভাবছিলাম। ইন্যুভার্সিটিতে তখনো আমার কোন বান্ধু বান্ধব গড়ে উঠেনি। লোক প্রশাসন বিভাগের অধিকাংশ মেয়েরাই অভিজাত পরিবারের। ওরা সবাই গ্রুপে গ্রুপে চলে। কি সব অর্থহীন বিদঘুটে সব টপিক নিয়ে আড্ডা করে অফ পিড়িয়ডে। মাঝে মাঝে আমি ওদের আড্ডায় যেচে পরে যাই। নিতান্তই সময় কাটানোর জন্যে। আমার ভালো লাগে না। চুপ চাপ বসে থাকি শুধু।

অফ পিড়িয়ডে বেশীর ভাগ সময়, আমার সময় কাটে সেমিনার রুমে। লোক প্রশাসন বিভাগ চার তলায়। এই এক তলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে চার তলায় উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিলো না আমার। লাইব্রেরীতে গেলে কেমন হয়? লাইব্রেরীর সামনের সিঁড়িতে বসে অনেকবার ক্লাশ মেইটদের আড্ডায় অংশ নিয়েছি। ভেতরে যাইনি কখনো। আমি ঠিক করলাম, লাইব্রেরীতে যাবো। আমি কলা ভবনের এক তলার কড়িডোরের পশিচম গেইটের দিকে এগুচ্ছিলাম। লাইব্রেরীতে যাবো ভেবে, মাঝ খানের গেইট দিয়ে বেড়োব বলে উল্টো ঘুরলাম। কড়িডোর ধরে কিছু দূর এগুতেই আমার সামনা সামনি পরলো, এই কিছুক্ষণ আগে সাবসিডিয়ারী ক্লাশে আমার পাশে বসা সেই মেয়েটি। মেয়েটি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললো, তোর কি এখন ক্লাশ আছে?

আমার জীবনে কাউকে আমি, তুই তোকারী করে ডাকিনি। নুতন ক্লাশ মেইটদের সাথে প্রথম পরিচিতিতে তুমি করে ডাকতেও দ্বিধা লাগে। অথচ, এই মেয়েটি অনেক দিনের পরিচিতার মতো করে বললো, তোর কি এখন ক্লাশ আছে?

মানুষকে আমি সহজে এড়িয়ে যেতে পারিনা। মেয়েটির কথায় আমি স্থির দাঁড়ালাম। এক কথায় বললাম, না।

মেয়েটি বললো, তাহলে চল দোকানে চা খেতে যাই।

আমি বললাম, স্যরি, এখন চা খাবার ইচ্ছে নেই।

মেয়েটি হাসলো মিষ্টি করে। বললো, চা খাবার ইচ্ছে নেই তো, খাবি না। আমার সাথে যাবি, আমার একা একা চায়ের দোকানে যেতে ইচ্ছে করছে না।

আমি বললাম, তাহলে অন্য কাউকে নিয়ে যাও। আমার ইচ্ছে করছে না।

মেয়েটি কেমন যেনো মন খারাপ করে ফেললো সাথে সাথে। কিছুক্ষণ চুপ চাপ থেকে বেশ গম্ভীর হয়ে, কিছুটা ভিন্ন গলায় বললো, আমার সাথে চায়ের দোকানে যেতে আপনার কি কোন সমস্যা হবে?

আমার কেনো যেনো মনে হলো, কিছুক্ষণ আগে সাবসিডিয়ারী ক্লাশে তাকে যে কথাটি বলেছিলাম, সেটিই আমাকে ফিরিয়ে দিলো সে। আর ভিন্ন গলাতে বলার উদ্দেশ্য হলো, আমার গলা নকল করার ব্যার্থ চেষ্টা।

আমার মনে হয় পৃথিবীতে সব চাইতে বিচিত্র বোধ হয় মানুষের মন। আমি সেই মানুষদেরই একজন। হঠাৎই কেনো যেনো আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির প্রতি, কেমন যেনো মমতার সৃষ্টি হলো। আমার কি হলো কে জানে? আমি ও মেয়েটির গলা নকল করার ব্যার্থ চেষ্টা করে বললাম, নাহ, কোনই সমস্যা হবে না।

মেয়েটি আমার কথায় খিল খিল করে হাসতে লাগলো। সে এক প্রাণ খোলা হাসি। অমন প্রাণ খোলে হাসতে, আমি আমার জীবনে খুব কম মানুষকেই দেখেছি। আমার জীবনে হাসির বিশেষ কেনো ঘটনা নেই। অনেকের মুখে শুনেছি, হাসলে আয়ু বাড়ে, আলসার হয়না। তারপর ও আমি হাসতে পারি না। এই মেয়েটির প্রাণ খোলা হাসি দেখে আমি ও তার সাথে সাথে হাসলাম। এবং অনেকটা সময় ধরে হাসলাম। এই মেয়েটির সুবাদে, আমার সত্যিকার আয়ুর চাইতে, কিছুটা সময়ের আয়ু বেড়ে ও যেতে পারে, কে জানে?

চিটাগং ইন্যুভার্সিটির কলা ভবন আর ক্যাফেটেরিয়ার মাঝ খানের গাছ গাছালীর ছায়াময় খোলা সীমানাটা ছেড়ে, খানিকটা ভেতরের দিকে অনেকগুলো চায়ের দোকান আছে। দূর থেকে দেখেছি, কখনো যাইনি। আমি মেয়েটির সাথে দোকানগুলোর দিকে এগুতে এগুতে বললাম, তোমার নাম কি তাতো জানা হলো না।

মেয়েটি বললো, আমার নাম হেনা। তোর নাম কি?

আমি বললাম, নদী।

মেয়েটি আমার নাম শুনে, তার সমস্ত দেহ দুলিয়ে খিল খিল করে হাসতে লাগলো।

আমি বললাম, হাসির কি হলো? নদী কি নাম হয়না?

মেয়েটি তার হাসি থামিয়ে বললো, ধুর! আমি কি তাই বলছি না কি? আমার এক কাজিনের নাম সাগর। তোর সাথে ওর মিল হলে বেশ মজার হতো!

আমি বললাম, ও, সেই কথা?

কথা বলতে বলতে, উপবৃত্তাকারে পাশাপাশি সজ্জিত দোকানগুলোর মাঝামাঝি দিকের একটা দোকানের সামনে রাখা বেঞ্চিতে এসে বসলো হেনা। আমি ও তার পাশে বসলাম। হেনার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হলো, এই দোকানে সে বরাবরই আসে। বেঞ্চিতে বসেই দোকানদারকে উদ্দেশ্য করে সে বললো, হারুন ভাই চা দেন।

হারুন নামের দোকানদারটা বললো, আর কিছু দিমু আফা?

হেনা বললো, না আর কিছু লাগবে না।

দোকানদার কিছুক্ষণের মধ্যেই দু কাপ চা বানিয়ে হাত বাড়িয়ে বললো, নেন আফা।

চায়ের কোন নির্দেশ আমি দিই নি। দু কাপ চা দেখে আমি অবাক হলাম। আমি দোকানদারকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আমি তো চায়ের কথা বলিনি।

আশচর্য্য, দোকানদারটা হাসি মুখে একটি চায়ের কাপ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, বুজতে পারি নাই আফা। ঠিক আছে অসুবিদা নাই।

তার আচরনে আমি খুব লজ্জিত বোধ করলাম। বললাম, ঠিক আছে, বানিয়ে যখন ফেলেছেন, দিন। দেখি আপনার দোকানের চা কেমন?

হারুন নামের দোকানদারটা আনন্দে ধেই ধেই করে উঠলো, বললো, অইটা বইলতে অইবনা আফা, অই আফা সব সম আমার চা খায়।

আমি চায়ে চুমুক দিতেই হেনা ফিশ ফিশ করে বললো, দেখ, ছেলেটা কেমন করে তাঁকিয়ে আছে আমার দিকে!

আমি বললাম, কোন ছেলেটা?

হেনা আমার হাতে চিমটি কেটে বললো, ধুর! আস্তে বল লোকে শুনবে।

আমি, হেনার মতো ফিশ ফিশ করে বললাম, কোন ছেলেটা?

হেনা, আমাদের থেকে কোনাকোনি দিকের একটা দোকানের দিকে ইশারা করে বললো, ওই যে সাদা টি শার্ট পরা ছেলেটা।

আমি চোখের কৌশলে, সাদা টি শার্ট পরা ছেলে খোঁজতে লাগলাম। যাকে খোঁজে পেলাম, তাকে দেখে মনে হলো সে আমার দিকে তাঁকিয়ে আছে। শুধু মনেই হলো না, সত্যিই ছেলেটা আমার দিকে তাঁকিয়ে আছে।

আমি হেনাকে বললাম, কই, ছেলেটা তো আমার দিকে তাঁকিয়ে আছে!

হেনা আড় চোখে একবার ছেলেটার দিকে তাঁকালো, তারপর বিড় বিড় করে বললো, তুই বেশী দেখিস।

আশচর্য্য, হেনা উঠে দাঁড়ালো, বললো, আমি গেলাম, তুই আমার চায়ের বিলটা দিয়ে দিস।

আমাকে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই চলে গেলো হেনা হন হন করে, তার ভারী পাছাটা দোলাতে দোলাতে। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কি ব্যাপার? মেয়েটির মাথায় কি কোন ছিট আছে নাকি? আশে পাশের মানুষেরা কি ভাবছে কে জানে? অথবা, এই হারুন নামের দোকানদারটা? আমার লজ্জা লাগতে লাগলো।

আমি চায়ে চুমুক দিলাম। নিজের অজান্তেই আমার চোখ গেলো ঐ সাদা টি শার্ট পরা ছেলেটার দিকে। ছেলেটা এখনো তাঁকিয়ে আছে আমার দিকে।

কিন্তু, আমি ভাবছি অন্য কথা। চায়ের বিলের কথা। জীবনে কখনো একা একা দোকানের চা খাইনি। মাঝে মাঝে দোলা আর আমি, বাবার সাথে বাইরে রেষ্টুরেন্টে খেতে যাই। বিলগুলো বাবা দেয় বলে, দু কাপ চায়ের দাম কত হয় ধারণা করতে পারছিলাম না। আমার পার্সে বিশ টাকার একটা নোট আর খুচরা দু এক টাকা ছাড়া বেশী নেই। এই টাকার মধ্যেই আমার আগামী দু দিন ইন্যুভার্সিটি যাতায়াতে, বাড়ী থেকে ট্রেন ষ্টেশনের রিক্সা ভাড়ার খরচ। আমার আর এই দোকানে বসে, আয়েশ করে চায়ে চুমুক দিতে ইচ্ছে হলোনা। দুঃশিচন্তায় পেটের ভেতরটা কেমন যেনো মুচর দিয়ে বদ হজম হতে লাগলো। ঐ সাদা টি শার্ট পরা ছেলেটার সাথে টাল্কি মারার মানসিকতা অন্তত এখন আমার নেই।

এই কিছুক্ষণ আগেও, হেনা নামের সদ্য পরিচিত মেয়েটির উপর প্রচণ্ড মমতার সৃষ্টি হয়েছিলো আমার, অথচ এখন প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে তার উপর। আমি আমার পার্সের ভেতর থেকে বিশ টাকার নোটটা বেড় করে, দোকানদারকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আপনার নাম তো হারুন! হারুন ভাই, আপনার চা খুব দারুন হয়েছে!

আমি বিশ টাকার নোটটা বাড়িয়ে ধরে বললাম, এই নিন আপনার চায়ের দাম।

দোকানদার হারুন বললো, আইজকে দাম দিত অইবনা আফা।

আমি অবাক হলাম, বললাম, কেনো? দাম দিতে হবেনা কেনো? আপনার দোকানের চা ফ্রী নাকি?

দোকানদার হারুন বললো, জেনা আফা, আফনে আফা পরতম আইলেন, অই আফা ও চা না খাইয়া চইল্লা গেল। আফনে ও সব চা খান নাই।

একজন সাধারন দোকানদার এমন ধরনের অতি সাধারন মমতা দেখালে অন্য কারো কি মনে হবে আমার জানা নেই। এই পৃথিবীতে অনেকের জীবনেই মনে হয়, কিছু তুচ্ছ ব্যাপার থাকে, যে সব ব্যাপার গুলো নিজের অজান্তেই চোখ ভিজিয়ে দেয়। দোকানদার হারুনের কথায় আমার চোখ দু টো ভিজে আসার উপক্রম হলো। আমি বললাম, হারুন ভাই, আজকে দামটা রাখুন, আমি আবারও আসবো আপনার চা খেতে। সরল প্রকৃতির এই হারুন নামের দোকানদারটা আবারও আনন্দে ধেই ধেই করে উঠলো। সে আমার টাকাটা নিয়ে ভাংতি কিছু টাকা ফেরৎ দিলো। আমি না গুনে ভাংতি টাকা গুলো পার্সে ঢুকিয়ে আপাততঃ বিদায় নিলাম দোকান এলাকা থেকে।

হেনার সাথে এর পর আরো কয়েকবার দেখা হয়েছে। সে একবার আলাপের সময় খুব আগ্রহ করে আমাদের বাড়ীর ঠিকানাটা টুকে নিয়েছিলো তার ডায়েরীতে। এরপর থেকে বেশ কয়েকবার সে আমাদের বাড়ীতে এসেছে। এবং প্রতিবারই একটা অসময়ে, খুব তুচ্ছ কিছু ব্যাপার নিয়ে আলাপ করতে। তাকে দেখে সব সময় আমার মনে হয়েছে যে, সে একটা খেয়ালী প্রকৃতির মেয়ে। এই ধরনের খেয়ালী প্রকৃতির মানুষগুলো আমার খুবই অপছন্দ। এরা খুবই স্বার্থপর প্রকৃতির হয়ে থাকে। নিজেকে ছাড়া অন্য কিছু বুঝেনা তারা, বুঝার চেষ্টাও করে না। এই সাত সকালে, দরজার ওপাশে হেনাকে দেখে আমার মেজাজটা সত্যিই খারাপ হলো। অথচ, মানুষকে আমি সহজে এড়িয়ে যেতে পারিনা। আমি দরজা খুলে বললাম, কি ব্যাপার হেনা? এই সাত সকালে? রাত কেটেছে কোথায় তোমার?

হেনা আমাকে অনেকটা ঠেলে ঘরের ভেতর ঢুকে বললো, নদী আমার বড় বিপদ!

আমি অনেকটা খেয়ালী ভাবে বললাম, তোমার বিপদ হবে না তো, কার হবে বলো?

হেনা বেশ অনুযোগের সুরে বললো, নদী, আমি খুব সীরিয়াস!

আমি বললাম, যদি খুব সীরিয়াস কোন ব্যাপার হয়ে থাকে, তাহলে ইন্যুভার্সিটি যেতে যেতে শুনবো। আমার ফার্স্ট পিড়িয়ডে ক্লাশ আছে। সাতটা চল্লিশের ট্রেনটা ধরতে হবে। তুমি বসো, আমি এক্ষুণি পোষাক পাল্টে আসছি।

আমি ভেতরের ঘরের দিকে ছুটলাম। দরজার কাছাকাছি গিয়ে আমি একবার ঘুরে দাঁড়ালাম। বললাম, নাস্তা করেছো হেনা?

হেনাকে কেমন যেনো অন্য রকম মনে হচ্ছে। সে হাঁ কিংবা না কিছু বললোনা। আমি তার সেই ভাবটাকে পাত্তা দিলাম না। আমি ভেতরের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

আমি পোষাক পালেট বসার ঘরে ফিরে এসে দেখলাম, হেনা নেই। আমি এ ঘর, ও ঘর খোঁজে দেখলাম, না কোথাও নেই। আশচর্য্য, রূপকথার গলেপর মতো উধাও হয়ে গেলো মেয়েটি? হেনার উপর আমার রাগটা আরো বাড়লো।

আমি রান্না ঘরে গিয়ে নাকে মুখে নাস্তা শেষ করে ইন্যুভার্সিটির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

ইন্যুভার্সিটিতে, ফার্স্ট পিড়িয়ডের ক্লাশ শেষে, ক্লাশ থেকে বেড়োতেই চোখে পরলো বারান্দার কংক্রীটের রেলিংয়ে বসে আছে হেনা। আমি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, কি ব্যাপার হেনা? অমন চোরের মতো চলে এলে যে আমাদের বাড়ী থেকে?

হেনা আমার কথার উত্তর না দিয়ে বললো, তোর কি এই পিড়িয়ডেও ক্লাশ আছে?

আমি বললাম, না। কিন্ত কি ব্যাপার বলোতো?

হেনা বললো, তাহলে চল, কোথাও গিয়ে বসি।

আমি এক রাখাল বালকের গলেপ শুনেছি, যে সব সময় বাঘ বাঘ বলে চিৎকার করতো। মানুষ তাকে অবিশ্বাস করতো। তাই, সত্যিকারের বাঘের কবলে যখন সে পরেছিলো, কেউ তাকে বাঁচাতে আসেনি। আমি হেনাকে বিশ্বাস করলাম, তার সংগে হাঁটতে হাঁটতে একটা গাছের ছায়াতে এসে বসলাম। আমি বললাম, এবার বলো কি বলবে?

হেনা বললো, আমার মিনস বন্ধ হয়ে গেছে।

আমি রাগ করার ভান করলাম। বললাম, এই কথা বলার জন্যেই কি সাত সকালে আমাদের বাড়ী গিয়েছিলে?

হেনা মাথা নাড়লো, বললো, হুম।

আমি বললাম, কিন্ত কেনো? আমি তো ডাক্তার না, ইরেগ্যুলার মিনস তো অনেক মেয়েদেরই হয়। আমারও হয়। তার জন্যে ডাক্তারদের পরামর্শ নিতে হয়। কিন্ত আমাকে বলে কি হবে?

আশচর্য্য, হেনার চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পরছে। আমি অবাক হলাম হেনাকে দেখে। আমি নিজে থেকেই বললাম, তুমি কি বলতে চাইছো, তুমি প্রেগনেন্ট?

হেনা মাথা নাড়লো, বললো, হুম।

আমি হাসলাম, বললাম, এরকম মনে হবার কারন? কারো সংগে দুষ্টুমির ব্যাপার স্যাপার চলছে নাকি?

হেনা বললো, ছিলো, এখন নেই। তাইতো সমস্যা!

হেনার কথায় আমি বোকা বনে গেলাম। এ তো দেখছি সাংঘাতিক ব্যাপার! আমি বললাম, এখন নেই কেনো?

হেনা বললো, আমার প্রেগনেন্সীর ব্যাপারটা ওকে জানাতেই উধাও হয়ে গেছে। দেখাও নেই, কোনো যোগাযোগ ও ছিলো না এত দিন। গতকাল সন্ধ্যায় ওর একটা চিঠি পেলাম। তাতে লেখা, স্যরি হেনা, আমাকে ক্ষমা করো।

হেনার কথা শুনে আমার গা শির শির করে উঠলো। বললাম, এখন কি করবে?

হেনা বললো, বুঝতে পারছি না। তাইতো তোর কাছে এলাম একটা পরামর্শের জন্যে।

হেনার প্রতি এত দিন আমার অনেক মিশ্র ধারনা ছিলো। তার খেয়ালী স্বভাবের জন্যে, কারনে অকারনে পাত্তা দিইনি তাকে আমি। কিন্ত, এই মুহুর্তে হেনাকে খুব অসহায় মনে হলো। ইচ্ছে হলো তার জন্যে কিছু একটা করি।

সুপ্রিয় পাঠক পাঠিকা, হেনাকে ভালো কোন পরামর্শ দিতে পারিনি আমি। সৃষ্টিকর্তা কিছু কিছু মানুষকে খুব সামান্যই ক্ষমতা আর বুদ্ধি দিয়ে, দুনিয়াতে পাঠিয়ে থাকেন। আমি তাদেরই একজন। হেনা যতটা আশা করে এসেছিলো আমার কাছে, একটা পরামর্শের জন্যে, তার কিছুই আমি করতে পারিনি। এরপর আর দেখাও হয়নি অনেক দিন হেনার সাথে। হেনার প্রতি প্রথম থেকেই আমার কোন আগ্রহ ছিলোনা। তাই ওর বাড়ীর ঠিকানাও জানা নেই আমার, যে একটা খোঁজখবর নেবো।

তারও অনেক অনেক দিন পর। আমি কলা ভবনের টিচার্স লাউঞ্জের পাশের সিঁড়ি ধরে নীচে নামছিলাম। ওপাশের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন দপ্তরের দিক থেকে, শুকনো গোছের একটি মেয়ে হাত নাড়তে নাড়তে এই দিকে আসছিলো। কাকে হাত নাড়ছে, কার দিকে এগিয়ে আসছে আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। আমি আমার মতো করে, এগিয়ে চললাম। মেয়েটি পেছন থেকে ছুটে এসে, আমার হাত টেনে বললো, কি রে নদী, আমি খারাপ বলে এড়িয়ে যাচ্ছিস, তাই না?

আমি মেয়েটির মুখের দিকে তাঁকিয়ে রইলাম ফ্যাল ফ্যাল করে। খুব চেনা চেনা লাগছে, অথচ চিনতে পারছিনা। আমি হাসলাম, বললাম, না, খেয়াল করিনি আসলে!

মেয়েটি আমার পাশে পাশে হাটঁতে লাগলো। চেনা চেনা লাগে, অথচ চেনা যায়না, এমন মানুষের সাথে কথা চালিয়ে যাওয়া খুবই বিরক্তিকর। আমি আমার মস্তিস্কের ভেতরের স্নায়ু নালী গুলোকে বহু মাত্রিক দিকে পরিচালিত করার চেষ্টা করলাম, মেয়েটিকে চেনার জন্যে। হঠাৎই আমি থমকে দাঁড়ালাম। আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, আরে! তুমি হেনা না?

মেয়েটি বললো, এতক্ষণে বুঝি আমাকে চিনতে পারলি?

আমি অবাক হলাম আমার সামনের এই হেনাকে দেখে। কি চমৎকার একটি মেয়ের একি চেহারা হয়েছে! শুকিয়ে একেবারে লাকরীর মতো হয়েছে তার দেহটা। চোখগুলো বসে গিয়ে কোটরে ঢুকেছে। গোলাকৃতি মুখমণ্ডলটা কেমন যেনো লম্বাটে লাগছে।

আমি খুবই আবেগ আপ্লুত হয়ে বললাম, একি চেহারা হয়েছে তোর? এমন শুকিয়ে গেলি কেন? এত দিন কোথায় ছিলি?

হেনা বললো, তোর এত প্রশ্নের উত্তর তো এক সংগে দিতে পারবোনা। আপত্তি না থাকলে, চল কোথায় বসি।

হেনার সংগে সেবারই আমার শেষ দেখা হয়েছিলো। হয়তো বা আবার কখনো দেখা হয়েও যেতে পারে। ঐ দিন অনেকটা দীর্ঘ সময় নিয়ে আলাপ করেছিলাম হেনা আর আমি। জানলাম, হেনার সংগে যে ছেলেটির সম্পর্ক ছিলো, তার সাথে আর যোগাযোগ হয়নি। হেনার বাবা মায়ের নির্দেশে তার পেটে একটা অপারেশন করতে হয়েছে, আর সেই সাথে ঘর থেকে বেড়োনোও বন্ধ হয়েছে। অপারেশনটা হবার পর থেকেই তার স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু করেছে।

হেনা ইন্যুভার্সিটি ছেড়েছে, তবে পড়ালেখা বন্ধ করেনি। প্রাইভেট ডিগ্রী পরীক্ষা দিয়ে ভালোভাবেই পাশ করেছে সে। আর সেই পাশের সার্টিফিকেট তুলার জন্যেই ইন্যুভার্সিটিতে এসেছিলো সেদিন।

হেনা এখন কোথায় আছে, কি করছে, আমার জানা নেই। তবে, তার কথা মনে হলে মনটা খুব খারাপ হয়ে উঠে আমার।

(হেনা চরিত্রটি সম্পুর্ণ কালপনিক। এই গলেপর স্হান, কাল আর পাত্রপাত্রীদের কারনে, কেউ যদি নিজের সাথে মিল পেয়েই যান তাহলে ক্ষমা করবেন।)